গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৫০ সংখ্যা | ২৫ - ৩১ জুলাই ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বাঙালি অস্মিতার নকল লড়াই

প্রধানমন্ত্রী এ রাজ্যে এর আগে অনেক সভা করেছেন। কখনও তাঁর মুখে 'বাঙালি অস্মিতা'র কথা শোনা যায়নি। ১৮ জুলাই দুর্গাপুরের প্রাক-নির্বাচনী সভায় তিনি হঠাৎ বাঙালি অস্মিতার কথা তুললেন কেন? শুধু তাতেই তিনি ক্ষান্ত হননি। বলেছেন, 'বিজেপির কাছে বাঙালি অস্মিতাই সবার উপরে।' এবং তা এতখানিই উপরে যে, বাঙালি অস্মিতার বিরুদ্ধে কোনও রকম ষড়যন্ত্রই নাকি বিজেপি সফল হতে দেবে না। এটা নাকি মোদির গ্যারান্টি।

'বাঙালি অস্মিতা' এবং তার রক্ষায় 'মোদির গ্যারান্টি'— প্রধানমন্ত্রীর মুখে এ সব কী শুনছে আজ বাংলার মানুষ! হঠাৎ কী এমন ঘটল যে প্রধানমন্ত্রীকে এ রাজ্যে ছুটে এসে এত সব কথা বলতে হচ্ছে?

বিজেপির অনুপ্রবেশ তত্ত্ব
দেশ জুড়ে বাংলার মানুষকে বিপদে ফেলছে

যা ঘটেছে তা হল, বিজেপি দীর্ঘ দিন ধরে যে অনুপ্রবেশ তত্ত্ব আওড়ে আসছে, তার সত্যতা প্রমাণ করতে দেশ জুড়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের ব্যাপক ভাবে ধরপাকড় শুরু করেছে পুলিশ ও বিজেপি-আরএসএস গুন্ডাবাহিনী। শ্রমিকদের মোবাইল, টাকা এবং বিভিন্ন ডকুমেন্ট কেড়ে নিয়ে মারধর করা হচ্ছে, জেলে ভরা হচ্ছে, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হচ্ছে, আবার কাউকে সীমান্তে নিয়ে গিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে। ওড়িশা, দিল্লি, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, হরিয়ানা, আসাম, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতেই এ ঘটনা ঘটছে। প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে, বাংলাভাষী মানেই বাংলাদেশি। এই ভাবে বাঙালি শ্রমিকদের গ্রেফতার করে বিজেপি একাংশের মানুষকে উদ্বিগ্ন করতে চায় যে, সারা দেশ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গেছে এবং এই অনুপ্রবেশই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিজেপির এই অনুপ্রবেশ তত্ত্ব প্রমাণের দাপটে অন্য রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকরা যেমন গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তেমনই শিক্ষিত বাঙালিদেরও দিল্লি, গুরুগ্রামের মতো জায়গায় কাজ পেতে, ঘরভাড়া পেতে, ফ্ল্যাট কিনতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। আসামে পরিকল্পিত ভাবে বাংলাভাষী বিশেষত সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ

দুয়ের পাতায় দেখুন

৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ সমাবেশের

ব্যাপক প্রস্তুতি রাজ্য জুড়ে

৫ আগস্ট এ দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনটিতেই অকালপ্রয়াত হয়েছিলেন এ যুগের অগ্রগণ্য মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক, এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ। গভীর প্রজ্ঞা থেকে তিনিই প্রথম অনুভব করেছিলেন যে, এ দেশের বুকে কমিউনিস্ট নাম নিয়ে একটি দল থাকলেও সত্যিকারের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দল হিসাবে সেটি গড়ে উঠতে পারেনি। তিনি এই সত্য গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান যুগে বিপ্লব সফল করতে হলে চাই লেনিনীয় মডেলের একটি দল। এই উপলব্ধির ভিত্তিতে তিনি মাত্র ২০-২১ বছর বয়সেই তাঁরই সমবয়সী মুষ্টিমেয় কয়েকজন তরুণকে নিয়ে এ দেশের বুকে একটি প্রকৃত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দল হিসাবে এসইউসিআই(সি) দলটি গঠনের কঠিন ও কষ্টসাধ্য সংগ্রাম শুরু করেন।

কৈশোরেই তিনি 'অনুশীলন সমিতি'র একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকা অবস্থায় তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৪২-'৪৫ এই তিন বছর কারাবাসকালে তিনি নানা দিক থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে মার্ক্সবাদ চর্চায় গভীর ভাবে নিমগ্ন হন এবং মার্ক্সবাদ সম্পর্কে তাঁর গভীর উপলব্ধি গড়ে ওঠে। তিনি বুঝতে পারেন, প্রতিষ্ঠাতাদের বহু আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম সত্ত্বেও একটি লেনিনীয় মডেলের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে হলে জীবনের সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করে যে পদ্ধতিতে ও

সাতের পাতায় দেখুন

নিগৃহীতা ছাত্রীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়ার প্রতিবাদে

ওড়িশায় সর্বাত্মক বনধ

দিল্লির ওড়িশা ভবনের সামনে বিক্ষোভ থেকে দলীয় কর্মীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ। ১৭ জুলাই

ওড়িশায় বালাসোর ফকির মোহন কলেজের ছাত্রীকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ, পুলিশ কর্তারা এবং শাসক বিজেপির নেতারা। ওই ছাত্রীকে তাঁর কলেজেরই এক অধ্যাপক যৌন নিগ্রহ করার পর তিনি প্রিন্সিপাল, পুলিশের এসডিপিও, এসপি, স্থানীয় বিজেপি সাংসদ এবং বিধায়কের কাছেও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ঔদাসীন্যের কারণে কোনও সমাধানের রাস্তা না পেয়ে নির্যাতনের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে কলেজের মধ্যেই ওই ছাত্রী ১২ জুলাই গায়ে আগুন দেন। ১৪ জুলাই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ঘটনা জানার পরেই রাজ্য জুড়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ দোষীদের কঠিন শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হন। সর্বত্র বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয় এস ইউ সি আই (সি)। ছাত্রদের সংগঠিত করে প্রতিবাদে নামে এআইডিএসও। দলের আহ্বানে ১৫ জুলাই রাজ্য জুড়ে শোক দিবসের কর্মসূচিতে অংশ নেন অসংখ্য মানুষ। ১৭ জুলাই রাজ্য জুড়ে ২৪ ঘণ্টা বনধের ডাক দেওয়া হয়। এআইডিএসও ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। অন্যান্য বামপন্থী দলও ওইদিন বনধের ডাক দিয়েছিল। নারী নির্যাতন রুখতে বিজেপি সরকারের প্রশাসনের চরম ঔদাসীন্য এবং ছাত্রীর যৌন নির্যাতনের ঘটনায় নীরব থেকে প্রশাসনের উচ্চস্তরের কর্তারাও বুঝিয়ে দেন দুষ্কৃতী-পুলিশ ও শাসক দলের নেতাদের অশুভ চক্রে তারা হস্তক্ষেপ করতে নারাজ। এর বিরুদ্ধে বনধের দিন রাজ্যে জনজীবন সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেন মানুষ। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত, দোষীদের কঠোর শাস্তি, উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ ও সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থ্রেট কালচার বন্ধের দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা করেন।

বাঙালি অস্মিতার নকল লড়াই

একের পাতার পর

করে বিপুল পরিমাণ জমি আদানির মতো ধনকুবেরকে ভেট দেওয়া হচ্ছে। এই বাঙালি বিদ্বেষ আসামে লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষী ভারতীয় নাগরিকের জীবন বিপন্ন করে তুলছে।

প্রধানমন্ত্রীর বাঙালি অস্মিতার ধাপ্পা

প্রধানমন্ত্রী বললেন, বিজেপির কাছে বাঙালি অস্মিতাই নাকি সবার উপরে। অথচ তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় একবারও রাজ্যে রাজ্যে ভারতীয় নাগরিক বাঙালিদের উপর যে পুলিশি নির্যাতন চলছে তার নিন্দা করলেন না। বললেন না, এ ভাবে কোনও ভারতবাসীকে পুলিশ বিনা প্রমাণে গ্রেফতার কিংবা শারীরিক নির্যাতন করতে পারে না। তা হলে 'বিজেপির কাছে বাঙালি অস্মিতাই সবার উপরে' প্রধানমন্ত্রীর এই কথাটি কি বাঙালিদের প্রতি একটা বড় ধাপ্পা নয়?

স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজেপির ফ্যাসিস্ট সুলভ এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এ ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে যে, বিজেপির রাজনীতি বাংলার মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই ক্ষোভের ব্যাপকতা আঁচ করেই ভোটের মুখে তাতে প্রলেপ দিতে দুর্গাপুরের সভায় প্রধানমন্ত্রী বাঙালি অস্মিতার কথা যেমন তুলেছেন, তেমনই 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি বাদ দিয়ে 'জয় মা দুর্গা', 'জয় মা কালী' বলে সভা শুরু করেছেন।

বিজেপি সংকীর্ণ ভোটস্বার্থে যে 'অস্মিতা'র রাজনীতি আনতে চাইছে তার মারাত্মক ফল আমরা এর আগে দেখেছি। মহারাষ্ট্রে বিহারীদের বিতাড়ন, আসামে বাঙালি বিতাড়ন ইত্যাদি কোনও অস্মিতাতেই সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হয়নি। তাই প্রধানমন্ত্রীর 'অস্মিতা' রাজনীতির ফাঁদে পা দেওয়াটা একেবারেই আত্মঘাতী হবে।

বাস্তবে এটি কোনও বাঙালি তথা প্রাদেশিক অস্মিতার বিষয় নয়। ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে বাংলাভাষী পশ্চিমবাংলার যে মর্যাদা প্রাপ্য বিজেপি আজ সেই মর্যাদায় আঘাত করেছে। পশ্চিমবাংলার প্রায় ১০ কোটি মানুষ বাংলাভাষী। এর বাইরেও আরও কয়েক কোটি বাংলাভাষী মানুষ আসাম, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড এবং অন্যান্য রাজ্যে বাস করেন। অথচ বিজেপি তার সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে বাংলাভাষী মাত্রেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দিতে চায় এবং সারা দেশে সেই প্রচারই তারা চালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন হতেন, তবে এ ভাবে বাংলাভাষী মাত্রেই বাংলাদেশি— এই হাস্যকর তত্ত্ব না আওড়ে যে সীমান্ত দিয়ে সাধারণত অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে সেগুলিতে আরও নিশ্ছিদ্র প্রহরার ব্যবস্থা করতেন। কৈফিয়ত চাইতেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কাছে যে, কী ভাবে অনুপ্রবশে ঘটতে পারছে। কিন্তু সে সব তিনি কিছুই করেননি। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দলের উদ্বেগ পুরোটাই সাজানো। এটিকে তাঁরা শুধুমাত্র ভোটের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু করে তুলতে চান। আর তাঁদের এই সংকীর্ণ ভোট-রাজনীতির শিকার হতে হচ্ছে বাংলাভাষী মানুষদের। মনে রাখতে হবে, কিছু কিছু অনুপ্রবেশ সব সময়েই ঘটে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল অর্থনীতির দেশ থেকে প্রতিবেশী দেশে কিছু কিছু অনুপ্রবেশের ঘটনা গোটা বিশ্বেই সাধারণ ঘটনা। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজের রাজ্য গুজরাট থেকেও খোদ আমেরিকায় কত সংখ্যায় অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটেছে, হাতকড়া পরিয়ে তাঁদের একাংশকে ট্রাম্প প্রশাসনের যুদ্ধবিমানে ফেরত পাঠানো থেকেই স্পষ্ট। ফলে বিষয়টিকে যুক্তির ভিত্তিতে বিচার করতে হবে।

তৃণমূলের ভূমিকা

অন্য দিকে বিজেপির এই অনুপ্রবেশের রাজনীতিকে 'বাংলা বিরোধী' হিসাবে তুলে ধরে বাঙালির ত্রাতা হিসাবে ভোটরাজনীতি স্বার্থ রক্ষায় নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। না হলে গত কয়েক বছর ধরেই যে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের এমন হেনস্থা চলছে, তৃণমূল সরকারকে কখনও তার বিরুদ্ধে সে ভাবে সোচ্চার হতে দেখা যায়নি। তারাও চেয়েছে এই হেনস্তা আরও গুরুতর আকার নিক। তখন তারা বাংলাভাষী বিশেষত মুসলিমদের ত্রাতা হিসাবে ময়দানে নামবে। ঠিক আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসে সেই 'ত্রাতা'র ভূমিকাতেই তাদের দেখা যাচ্ছে। না হলে অনেক আগেই তারা ওই সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, প্রশাসনিক প্রধান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করতেন, এবং অবিলম্বে এমন অগণতান্ত্রিক, বেআইনি স্বৈরাচার বন্ধের দাবি জানাতেন। বিষয়টিকে জাতীয় রাজনীতির বিষয় করে তুলতেন। তা তাঁরা করেননি।

বাঙালি অস্মিতার কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বাংলার শিল্পের দুর্দশা, শিক্ষায় নৈরাজ্যের কথা বলেছেন। বলেছেন, তৃণমূল নিজের স্বার্থে বাংলার সংস্কৃতিকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছে। বলেছেন, তৃণমূল বাংলার বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে। এই কথাগুলো ভুল নয়। বাংলার শিক্ষাকে সর্বনাশের অতলে ঠেলে দিয়েছে তৃণমূল সরকার। বাংলার গর্ব যে স্কুল শিক্ষাব্যবস্থা, তা আজ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে তৃণমূল সরকার। শুধু স্কুল নয়, কলেজগুলিরও একই অবস্থা। স্কুলগুলিতে শিক্ষক নেই, ক্লাস হয় না। পরিণতিতে ছাত্রসংখ্যা ক্রমাগত কমে চলেছে। কলেজগুলিতেও পর্যাপ্ত অধ্যাপক নেই। কিন্তু এ সবই যে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপি সরকারের শিক্ষানীতি এ রাজ্যে প্রয়োগেরই ফল, প্রধানমন্ত্রী তা চেপে গেলেন। উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ দীর্ঘ দিন হয়ে গেলেও এখনও ভর্তি প্রক্রিয়াই শেষ হয়নি। বাস্তবে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া সিপিএম শাসনে শুরু হয়েছিল, তৃণমূল সেই প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের নিচের তলার দরিদ্র, নিম্নবিত্ত বিরাট অংশের কাছে সরকারি শিক্ষার নামে যা যাচ্ছে তা বাস্তবে দুধের বদলে পিটুলি গোলা জল ছাড়া আর কিছু নয়। তৃণমূল সরকার শিক্ষার বেসরকারিকরণের রাস্তাটিকে হাট করে খুলে দিয়েছে এবং রাজ্যের মানুষকে বাধ্য করছে শিক্ষা নামক পণ্যটিকে বিপুল দামে কিনতে। এটাই তো জাতীয় শিক্ষানীতিতে মোদি সরকার চেয়েছে।

রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি কী ভয়াবহ আকার নিয়েছে তা আজ কারও অজানা নয়। শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি এখন আদালতে বিচারাধীন। ঘুষকাণ্ড এবং নিয়োগ মামলায় ইডি এবং সিবিআই গ্রেফতার করেছিল শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জীকে। কিন্তু সিবিআইয়ের সেই মামলার পরিণতি কী? সে দিন বিজেপি নেতারা বলেছিলেন, দুর্নীতি মামলায় কেউ রেহাই পাবে না। সিবিআই সবাইকে গ্রেফতার করবে। প্রধানমন্ত্রী কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় একবারও বললেন না, কেন সিবিআইয়ের এই মামলা গতি হারাল, কেন দুর্নীতিতে জড়িত বাকি নেতারা গ্রেফতার হলেন না? তা ছাড়া বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিও যে চরম দুর্নীতিতে ডুবছে সে কথা কি বক্তৃতার সময়ে প্রধানমন্ত্রী ভুলে গিয়েছিলেন? ভুলে গিয়েছিলেন দেশের এ যাবত সবচেয়ে বড় দুর্নীতি মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকারের ব্যপম কেলেঙ্কারির কথা? তা হলে দুর্নীতি নিয়ে তাঁর এই বক্তব্য একপেশে। তাঁর উদ্বেগ একেবারেই মেকি। এই ছদ্মউদ্বেগের কী মূল্য রয়েছে বাংলার মানুষের কাছে?

বাস্তবে প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন নির্বাচনী বক্তৃতা দিতে, যা এর আগেও তিনি বহুবার দিয়ে গেছেন। তৃণমূলের দুর্নীতি এবং অপশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ মানুষের সমর্থন নিজের দলের দিকে টানতেই তাঁর এই বাঙালি-ভক্তির বাহানা। তাই যে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের হাসপাতালেও মহিলারা সুরক্ষিত নন বলে গভীর উদ্বেগ দেখিয়ে বলেন, আপনারা দেখেছেন, মহিলা চিকিৎসকের উপরে অত্যাচারের পরে তৃণমূল কী ভাবে অপরাধীদের আড়াল করেছিল। হ্যাঁ, এ কথা আজ আর কারও অজানা নয় যে, আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল প্রশাসন নির্লজ্জ ভাবে আড়াল করে চলেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সিবিআই কেন তৃণমূল সরকারের মতো একই ভাবে দোষীদের আড়াল করে চলেছে, সততা থাকলে প্রধানমন্ত্রী তো সে উত্তরটাও প্রকাশ্য সভায় দিতেন। কিন্তু তিনি তা দেননি। কাকে আড়াল করতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী? তৃণমূল সরকারকে, নাকি সিবিআইকে? তা হলে ফারাকটা কোথায় থাকল তৃণমূল কংগ্রেস আর বিজেপিতে?

সংগ্রামী ঐতিহ্যই বাংলার অস্মিতা

প্রধানমন্ত্রী মুখে যতই বাঙালি অস্মিতার পক্ষে কথা বলুন, বাস্তবে বাঙালি অস্মিতা বলে বাংলার মানুষের কাছে আলাদা কিছু কোনও দিনই ছিল না, আজও নেই। অস্মিতার বাহনে বাংলায় প্রাদেশিকতার চর্চা জায়গা করতে পারেনি। এবং তা হয়নি নবজাগরণ, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং পরবর্তী সময়ে বামপন্থী আন্দোলনের ঐতিহ্যের কারণেই। বাঙালি অস্মিতা যদি কিছু থাকে তবে তা এটাই। বাংলার এই আপসহীন সংগ্রামের চেতনায় সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে আজ বিজেপি এবং তৃণমূল উভয়েই তাদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ধ্বংস করছে। এই নবজাগরণের সঙ্গে বিজেপি বা তার পূর্বসূরী হিন্দু মহাসভা, জনসংঘের কোনও সম্পর্ক ছিল না। বরং এই সংগঠনগুলি ছিল ভারতীয় নবজাগরণের চিন্তার সম্পূর্ণ বিরোধী। রামমোহনের ধারাবাহিকতায় বিদ্যাসাগরের চিন্তা বিকশিত হয়েছিল ধর্মের সঙ্গে ছেদ ঘটিয়ে সেকুলার তথা পার্থিব মানবতার পথে। সেই একই চিন্তার নানা রূপ নানা মাত্রায় আমরা দেখতে পাই একদিকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলের মধ্যে, অন্য দিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন বোসদের মধ্যে। বাস্তবে বাঙালি অস্মিতা যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা এই নবজাগরণের বিকশিত চিন্তা এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়েই। বিজেপির পূর্বসূরী সংগঠনগুলি তো স্বাধীনতা আন্দোলনকেই স্বীকার করেনি। তাই তারা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি শুধু নয়, তার বিরোধিতা করে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে গেছে। তাই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপির স্বরাষ্টমন্ত্রীর মিছিল থেকে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙতেও যেমন তাদের বাধে না, তেমনই বিদ্যাসাগর এবং পরবর্তীকালের শিক্ষাবিদরা যে ধর্মনিরপেক্ষ, সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, জাতীয় শিক্ষানীতির নামে সেই শিক্ষানীতিকে ধ্বংস করে অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিহাসিক শিক্ষা চালু করতেও বাধে না। তাই প্রধানমন্ত্রী কিংবা বিজেপি নেতাদের মুখে কখনও রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল কিংবা ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা, নেতাজির কথা শোনা যায় না, শোনা যায় দেশভাগের অন্যতম প্রবক্তা, চরম সাম্প্রদায়িক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কথা। এ রাজ্যে এমন কোনও বিজেপি সমর্থক পাওয়া যাবে না যিনি নেতাজির প্রতি অনুরক্ত নন। অথচ নেতাজি নিজে হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সাম্প্রদায়িক চিন্তাকে বাংলার রাজনীতি থেকে বিসর্জন দিতে দেশের মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। বিজেপির রাজনীতিকে সমর্থন করলে বাংলার এই ঐতিহ্যকে সম্মান দেওয়া যায় না।

পুঁজিপতিদের বেঁধে দেওয়া ছকের বাইরে মানুষকে ভাবতে হবে

আজ রাজ্যের মানুষকে বুঝতে হবে যে, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে বিজেপি রাজনীতির মূলগত ফারাক বিশেষ কিছু নেই। তৃণমূল কংগ্রেস একটি আঞ্চলিক দল, বিজেপি জাতীয় দল। একটি দল আঞ্চলিক পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী, অন্যটি জাতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী। উভয়ের নীতিই পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী, তাই জনবিরোধী। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, জনগণের জন্য শিক্ষা-চিকিৎসার সুযোগ, কিংবা নারীর মর্যাদা রক্ষা সমস্ত প্রশ্নেই উভয়ে একই নীতি নিয়ে চলে। তাদের মধ্যে যে বিরোধ, তা হল পুঁজিপতি শ্রেণির অবাধ শোষণ-লুণ্ঠনের সহায়তা করার মধ্য দিয়ে তাদের আর্শীবাদধন্য হয়ে কে ক্ষমতার গদিতে বসবে, তা নিয়ে। তাই বর্তমানের সংকট-জর্জরিত পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিদিন যে নতুন নতুন সংকটের জন্ম দিচ্ছে সেগুলি সমাধান দূরের কথা, উভয় সরকারের নীতিতেই তা আরও তীব্র হচ্ছে। এই অবস্থায় পুঁজিপতি শ্রেণি এবং তাদের পারিচালিত সংবাদ মাধ্যমের বেঁধে দেওয়া ছকের বাইরে বেরিয়ে এসে জীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের রাস্তা মানুষকে খুঁজতে হবে। বাঙালি অস্মিতার আবেগে ভুলে যাওয়া চলে না যে, দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতোই বাংলার মানুষও তীব্র অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সঙ্কটে নিমজ্জিত। এ-ও ভুললে চলবে না যে, সরকার পরিবর্তনে এই সঙ্কটের সমাধান হবে না।

সংবিধানে ‘সমাজতান্ত্রিক’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দ যোগ

কংগ্রেসের কৌশল, বিজেপির বিড়ম্বনা

সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে ‘সমাজতান্ত্রিক’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দ দুটি বাদ দেওয়ার পক্ষে কিছুদিন ধরে সওয়াল করছেন আরএসএস এবং বিজেপি নেতারা। আরএসএস-এর সাধারণ সম্পাদকের পর বিজেপি নেতা তথা উপরাষ্ট্রপতিও ভারতের সংবিধান থেকে শব্দ দুটি বাদ দেওয়ার জন্য জোর সওয়াল করেছেন। বোঝা যায় এই শব্দ দুটিতে আরএসএস-বিজেপির ঘোর আপত্তি। কিন্তু কেন?

এ সম্পর্কে আরএসএস-বিজেপির প্রথম যুক্তি, ১৯৭৬-এ কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করে বিরোধী নেতাদের জেলে পুরে রেখে জোর করে এই শব্দ দুটি সংবিধানের প্রস্তাবনায় যুক্ত করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় যুক্তি— সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা হল পাশ্চাত্যের কট্টর এবং নেতিবাচক ধারণা, যা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না।

প্রসঙ্গত, এই শব্দ দুটি সংবিধান থেকে বাদ দেওয়ার আর্জি জানিয়ে আরএসএস-বিজেপির উদ্যোগে দায়ের করা বেশ কয়েকটি মামলা খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তার পরেও তারা ফের এই প্রসঙ্গ তুলছে। যদিও সংবিধানে গণতন্ত্র, জনগণের অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে লেখা যাই থাক, তাতে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণে, সরকারের সমালোচকদের বিনা বিচারে মিথ্যা মামলায় জেলে পুরতে বিজেপির কি কোনও অসুবিধা হচ্ছে? কংগ্রেসেরও তা হয়নি। সংবিধানে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটির জন্য কংগ্রেসের যেমন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে কোনও অসুবিধা ছিল না, বিজেপিরও কার্যত কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। আবার ‘সমাজতান্ত্রিক’ শব্দটিকে রেখেই কংগ্রেস এবং বিজেপি দুটি দলই ভারতে পুঁজিপতি শ্রেণির মুখ্য সেবাদাস হিসাবে দেশের সাধারণ মানুষের ওপর তাদের বেলাগাম শোষণ চালানোর অবাধ ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। কারণ তারা জানে, ‘সমাজতান্ত্রিক’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দ দুটি সংবিধানের অন্যান্য বহু অধিকারের মতো শুধুই কথার কথা।

প্রসঙ্গ ঃ সমাজতন্ত্র

ইন্দিরা গান্ধী সমাজতান্ত্রিক শব্দটি সংবিধানে ঢুকিয়েছিলেন কেন? ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস সরকার যে অত্যাচারী শাসন-শোষণ চালিয়ে এসেছে তার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ তখন তুঙ্গে। এ দিকে বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নত মান, তাদের উন্নত জীবনধারা ভারতের খেটে খাওয়া মানুষকে যে প্রবল আকর্ষণ করে তা পুঁজিপতিরাও অস্বীকার করতে পারে না। এই সময় ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বে ভারত সরকার ব্যাঙ্ক, বিমা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয়করণ করে। এই পদক্ষেপ ছিল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পুঁজিকে কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে বৃহৎ পুঁজি মালিকদের সাহায্য করার জন্যই। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি এর ফলে শক্তিশালী হয়। কিন্তু এর আসল চরিত্রকে আড়াল করতে প্রচারমাধ্যম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জাতীয়করণের সাথে এর তুলনা করতে থাকে, যাতে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া যায়। সিপিআই-সিপিএমের মতো বামপন্থী দলগুলিও পুঁজিপতি শ্রেণি ও কংগ্রেসের প্রকৃত মতলবকে উন্মোচিত না করে একে ‘সমাজতন্ত্রের দিকে’ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করে। এই সময় ১৯৭৫-এ ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনকে বেআইনি বলে রায় দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এই রায় এড়িয়ে গদি ধরে রাখতে ১৯৭৫-এর ২৫ জুন ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন ‘জরুরি অবস্থা’। ১৯৭৬-এ ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারবিভাগের ক্ষমতা খর্ব করা ও আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি করা হয়। পাশাপাশি জনমানসে নিজের স্বৈরাচারী মুখকে আড়াল করতে ইন্দিরা গান্ধী কিছু কিছু প্রগতিশীল স্লোগান দিতে থাকেন। এই সময়েই তিনি সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘সমাজতান্ত্রিক’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দ দুটি যুক্ত করেন। জাতীয় ঐক্যের সাথে ‘সংহতি’ শব্দটিও ঢোকানো হয়। যদিও ইন্দিরা গান্ধী নিজেই পুঁজিপতিদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র নিয়ে তাঁরা যেন ভয় না পান। তিনি বলতেন, ‘তোমরা আমায় সমাজতন্ত্রী বলে ডাকতে পারো... আমার দারিদ্র দূর করার কথাকে কারও সমাজতন্ত্র মনে হতে পারে, কিন্তু এই শব্দটার ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক হলে আমি বলতে চাই, আমি এই শব্দটার দিকে তাকাতেও চাই না। আমি এই রকম কোনও শব্দে আদৌ বিশ্বাস করি না’ (ব্লেমা স্টেইনবার্গ ঃ উইমেন ইন পাওয়ার, দ্য পার্সোনালিটিজ অ্যান্ড লিডারশিপ স্টাইলস অফ ইন্দিরা গান্ধী, গোল্ডা মেয়ার অ্যান্ড মার্গারেট থ্যাচার)। যতদিন সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল, ততদিন ভারতীয় বুর্জোয়া শাসকরা শ্রমিক-কৃষক-খেটে খাওয়া মানুষের ওপর শোষণের স্টিম রোলার চালাতে চালাতেও কিছু কিছু সামাজিক সুরক্ষা, গণতান্ত্রিক অধিকার, যথেচ্ছ ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে শ্রমিকের রক্ষাকবচ ইত্যাদি চালু রাখতে বাধ্য হত। পুঁজিপতিরা চাইলেও সরকার একেবারে এ সব বাতিল করে দিতে পারেনি। সমাজে ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভকে এর সাহায্যে কিছুটা স্তিমিত করতে চেয়েছে তারা। ফলে ভারতীয় সংবিধানে ‘সমাজতান্ত্রিক’ শব্দ যোগ করাটা ছিল খেটে-খাওয়া মানুষকে ঠকানোর জন্য শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির নিছক একটা কৌশল। অন্য দিকে, খেটে-খাওয়া মানুষের কাছে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং উন্নত জীবনই আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এই আকাঙ্ক্ষার শক্তিকে আজও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কর্ণধাররা যে একেবারে উপেক্ষা করতে পারে না, সম্প্রতি তার প্রমাণ আবার পাওয়া গেল, যখন সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র বাদ দেওয়া নিয়ে বিজেপি ঘনিষ্ঠদের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই প্রসঙ্গে বলল—এ দেশে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা কিংবা ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদের ইচ্ছা থেকে ‘সমাজতান্ত্রিক’ শব্দটি সংবিধানে লেখা হয়নি। শব্দটি থাকা দরকার এই জন্য যাতে মানুষের মনে এই আশাটুকু জাগিয়ে রাখা যায় যে, রাষ্ট্র ধনবৈষম্য দূর করতে না পারুক, তা অন্তত করতে চায়। ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের রক্ষাকর্তা হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ দেখিয়ে দিচ্ছে, ‘সমাজতন্ত্রের ভূত’ সেই মার্ক্সের সময় থেকে শুরু করে আজও বুর্জোয়া শাসকদের কী ভাবে তাড়া করে বেড়াচ্ছে! রাষ্ট্রের কর্ণধাররা জানেন, তাঁদের শত বিষোদগার সত্ত্বেও খেটে-খাওয়া মানুষের মন থেকে শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা আর সমাজতন্ত্রের স্বপ্নকে মুছে দেওয়া অসম্ভব। তাহলে বিজেপি এই নিয়ে আসর গরম করছে কেন? আসলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোটবাজারের চ্যাম্পিয়ন সাজতে এবং একই সাথে সমাজতন্ত্রের সাথে সুকৌশলে ইন্দিরা জমানার স্বৈরাচারী শাসনকে এক করে দেখানোর হীন উদ্দেশ্যে তারা এই জিগির তুলছে। কিন্তু যদি তারা সংবিধানের পাতা থেকে ‘সমাজতন্ত্র’ কথাটা মুছে দিতে সফলও হয়, কোনও শক্তির সাধ্য নেই খেটে খাওয়া মানুষের মন এবং আগামী দিনের মুক্তি আন্দোলনের পথরেখা থেকে তা মুছে দেয়।

প্রসঙ্গ ঃ ধর্মনিরপেক্ষতা

একই ভাবে, সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটা নিয়েও নানা বিভ্রান্তি ছড়ানো চলছে। মনে রাখা দরকার, এ ধারণা কমিউনিস্টরা গড়ে তোলেনি। সমাজ বিকাশের ধারাতেই ধর্মভিত্তিক সামন্তী রাষ্ট্রকে পিছনে ফেলে আরও উন্নত এই গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা এসেছে। ধর্মের ভিত্তিতে এই রাষ্ট্র বিকশিত হয় না। হলে ইউরোপের ক্রিশ্চান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলি সকলেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠত না। সামন্তী যুগে রাজা বা সামন্তপ্রভুরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেদের তুলে ধরে শাসন করত। সমাজে সম্পত্তির মালিকানা ছিল রাজার। তাদের শক্তি ছিল ধর্মান্ধতা, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের অন্ধ আনুগত্য। এর বিরোধিতা করে নতুন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের স্বার্থে প্রয়োজন ছিল সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এর থেকেই এসেছে নবজাগরণ বা রেনেসাঁস, এসেছে গণতন্ত্রের ধারণা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল চার্চ বা অন্য ধর্মপ্রতিষ্ঠানের আধিপত্য থেকে তাকে মুক্ত রাখা। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণা বলে— রাষ্ট্র কোনও ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না, কোনও ধর্মকে উৎসাহ দেবে না, কোনও ধর্মকে বাধাও দেবে না। ধর্ম কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জায়গায় থাকবে। কেউ চাইলে তা মানতে পারে, আবার কোনও ধর্ম, এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে না মেনেও কেউ চলতে পারে। এ ভাবেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণার সাথে যুক্ত হয়েই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার উদ্ভব হয়েছিল। ইউরোপে এর জন্ম হলেও একে কোনও মতেই বিদেশি মতবাদ বলা চলে না। দ্বিতীয়ত, ভারতের মতো একটি বহু ধর্ম অধ্যুষিত দেশে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ না হলে অবধারিতভাবে তার পক্ষে গণতান্ত্রিক হওয়াও অসম্ভব। রাষ্ট্রনায়করা যদি কোনও একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি বেশি অনুরক্ত হন, তাহলে তাঁদের অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি নিরপেক্ষ সমদৃষ্টি রাখা সম্ভব নয়। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে মূল লক্ষ্য, সকলের জন্য সমান সুযোগ, তা থেকে ভিন্ন ধর্মের মানুষরা বঞ্চিত হবেনই। এই পথেই জায়গা করবে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গি। তা ছাড়া ভারতে শাসকদলগুলি যেভাবে ভোটের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটাতে বিদ্বেষ ছড়ায়, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার বিকাশ ক্রমাগত না বাড়াতে পারলে সমাজকে ধর্মীয় বিভেদ থেকে মুক্ত করে ঐক্য সংহতি রক্ষা করাই হবে দুরূহ। বিজেপি নেতারা বলে থাকেন ভারতে যেহেতু হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই এ দেশটাকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করতে বাধা নেই। ইতিহাসের শিক্ষা মানলে এ কথা তাঁরা বলতে পারতেন না। তাঁরা ভুলিয়ে দিতে চাইছেন যে, এই ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এক যোগে লড়াই করেছে। এই সংগ্রামের মূল সুরটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, আসফাকউল্লা খানের মতো আপসহীন ধারার সংগ্রামীরা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলের মতো শিল্পী-সাহিত্যিকরা এই আদর্শটিকেই তুলে ধরেছেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সুস্পষ্ট ভাষায় হিন্দুরাজের ধ্বনির তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার সাথে আপসকামী ধারাই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। বিপ্লবভীত জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি এটাকেই মূলত সাহায্য করেছে। ফলে ভারতীয় জাতীয়তা বোধের সাথে ধর্মীয় বিভেদ, প্রাদেশিকতা, জাতপাতের বিভেদ খাদ হয়ে মিশে থেকেছে। যদিও স্বাধীনতার পর বুর্জোয়া শাসকরা যতই ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার সাথে আপস করুন, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী আপসহীন ধারার রেশ মানুষের মধ্যে কাজ করায় দেশের মানুষের সামনে নেতাদের ধর্মনিরপেক্ষ থাকার কথা বলতে হয়েছে। যদিও তাঁরা এর প্রকৃত অর্থ থেকে সরে গিয়ে সব ধর্মকে সমান উৎসাহদানের মতো পর্যায়ে বিষয়টিকে ঠেলে দিয়েছেন। তাঁরা প্রচার করতে থাকেন, এটাই নাকি ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা! ভাবখানা এমন যে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়টা বিদেশি, ভারতে তা চলে না। যেন কোনও বিশ্বজনীন আদর্শ, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ইত্যাদির মর্মার্থ সারা বিশ্বের থেকে ভারতে এসেই অলাদা হয়ে যায়! যদিও এই সব নেতারা গাড়ি চড়েন বিদেশি, এমনকি ঘড়ি চশমা পর্যন্ত তাঁদের বিদেশি। যে সংসদীয় গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করে তাঁরা বিলাসবহুল জীবন কাটান, সেই গণতন্ত্রের উৎসও ইউরোপে। এতে তাঁদের কোনও অসুবিধা নেই, অসুবিধা শুধু ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করতে!

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বিজেপির এই ভণ্ডামিতে বিজেপির সুবিধা করে দিয়েছে কংগ্রেসই। তারা স্বাধীনতার পর থেকে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির স্বার্থে কখনও হিন্দুত্ববাদে ইন্ধন দিয়েছে, কখনও সংখ্যালঘু ভোট পাওয়ার জন্য তাদের ত্রাতা সাজতে চেয়েছে। যে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থার সময় ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটি

ছয়ের পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্কে ব্যাপক কর্মী ছাঁটাই, তুমুল বিক্ষোভ

বেসরকারি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক গত ছয়-সাত বছরে অন্যায় এবং বেআইনিভাবে ১০ হাজারের বেশি স্থায়ী কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। ব্যাঙ্কের চুক্তিভিত্তিক কর্মীরাও নানা অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের শিকার। এ সবের বিরুদ্ধে যাতে কোনও আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সে জন্য ব্যাঙ্কের ভেতরে ইউনিয়ন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রবল বাধা সৃষ্টি করছে কর্তৃপক্ষ। এর বিরুদ্ধে কর্মচারীরা শ্রম আদালতের দ্বারস্থ হলেও কর্তৃপক্ষ শুনানির দিন প্রতিনিধি না পাঠানোয় কেস চলে যাচ্ছে লেবার ট্রাইবুনালে। ট্রাইবুনালগুলোতে বেশিরভাগ সময়ে কোনও বিচারক না থাকায় কেস ফয়সালা হতে বছরের পর বছর কেটে যায়।

এর প্রতিবাদে এবং বিভিন্ন দাবিতে ১৮ জুলাই ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের নেতৃত্বে শতাধিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কলকাতা জোনাল অফিস অভিযান করে।

কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনায় বসতে রাজি না হওয়ায় আন্দোলনকারীরা জোর করে ব্যাঙ্কের ভেতর ঢুকতে গেলে বিশাল পুলিশবাহিনী বাধা দেয়। তাতেও আন্দোলন স্তিমিত করা যায়নি। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ইন্সপেক্টর নিজে ব্যাঙ্কের ভিতর ঢুকে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে নিয়ে এসে ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য করেন। আলোচনায় ছাঁটাই নিয়ে ইউনিয়নের বক্তব্য হেড অফিসে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন জগন্নাথ রায়মণ্ডল, গৌরীশঙ্কর দাস, গোপাল দেবনাথ এবং নির্মল মাঝি।

আসানসোলে ৫ আগস্ট প্রস্তুতিতে বুকস্টল

৫ আগস্ট এসইউসিআই(সি)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস উপলক্ষে ১৯ জুলাই আসানসোলে বিএনআর-এ রবীন্দ্রভবনের সামনে তাঁর উদ্ধৃতি প্রদর্শনী ও বুকস্টলের আয়োজন করা হয়।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন দলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী। অন্যান্য নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দাবি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের

সুসংহত শিশু বিকাশ কেন্দ্রে পুষ্টির জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, বেতন বৃদ্ধি, পোষণের কাজ করানোর জন্য সেন্টারের নামে সিম কার্ড এবং মোবাইল দেওয়া, কর্মী এবং সহায়িকাদের সেন্টারে খাওয়ার অধিকার বজায় রাখা প্রভৃতি দাবিতে ১৫ জুলাই রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং শিশুকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে বিক্ষোভ ডেপুটেশন হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে কয়েক হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হয়ে নবান্ন অভিমুখে রওনা হন। মিছিল শুরুর আগে সমাবেশে সংগঠনের সম্পাদক মাধবী পণ্ডিত সহ অন্য নেতৃবৃন্দ তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

এসপ্ল্যানেডে ডোরিনা ক্রসিংয়ে পুলিশ মিছিল আটকে দেয়। পুলিশি বাধায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী রীতা মাইতি, আহত হন রেবা পাত্র, শকুন্তলা সামন্ত সহ কয়েক জন। রীতা মাইতিকে মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ভর্তি করা হয়।

রাজ্যপালের কাছে আরিফা বেগম, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পূর্ণিমা দণ্ডপাট, ও শিশুকল্যাণ দপ্তরে মাধবী পণ্ডিতের নেতৃত্বে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মাধবী পণ্ডিত জানান, দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর ধর্মঘটের দিকে যেতে বাধ্য হবে কর্মী সহায়িকারা।

নেসেসিটির যথার্থ উপলব্ধি কী?

শিবদাস ঘোষ

নেসেসিটির যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা এবং পেরে সচেতনভাবে সেই অনুযায়ী ক্রিয়া করতে পারার নামই ফ্রিডম অর্জন করা।

৫ আগস্ট ১৯২২ - ৫ আগস্ট ১৯৭৬

যখন সেই প্রক্রিয়াটা বুঝে সেই প্রক্রিয়াতে সচেতন ভাবে আমি ক্রিয়া করি এবং সংগ্রাম করি— তখনই আমি ফ্রিডম অর্জন করার জন্য সংগ্রাম করছি বলা চলে। তার আগে পর্যন্ত আমার ফ্রিডম সম্পর্কে ধারণা হল আত্মপ্রতারণা বা সেল্ফ ডিসেপশন বা প্র্যাগম্যাটিক কনসেপ্ট অফ নেসেসিটি, যেটা সোজা কথায় হল সুবিধাবাদ। সে হতে পারে ব্যক্তিগত সুবিধাবাদ অথবা রাজনীতিগত সুবিধাবাদ।

প্র্যাগম্যাটিক নেসেসিটি হল, মার্ক্সবাদ যে নেসেসিটির অনুসন্ধান করতে বলে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মার্ক্সবাদ যখন নেসেসিটির কথা বলে, তখন সে বস্তুর মধ্যে নিহিত প্রক্রিয়া এবং নিয়ম, তার গতিধারা লক্ষ করতে বলে। বস্তুর বিকাশে, জীবন বিকাশে, সমাজ বিকাশে বস্তুর গতিধারায় কী কী নিয়ম এবং তার গতিধারা কোন দিকে, তা যথার্থ নিরূপণ করতে পারলেই নেসেসিটি সম্পর্কে আমাদের যথার্থ বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি ঘটল বা ধারণার যথার্থ উপলব্ধি ঘটল। কিন্তু চরিত্রে, ক্রিয়ায় আমরা ফ্রিডম অর্জন করলাম তখন, যখন সেই প্রক্রিয়ায় আমরা সচেতনভাবে ক্রিয়া করতে এবং সংগ্রাম করতে সক্ষম। তখনই আমরা যথার্থই ফ্রিডম কথাটার মানে বুঝলাম। তার আগে আমরা ফ্রিডম কথাটা বলছি বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে, কিন্তু তার যথার্থ মানে বুঝিনি।

'বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়'

স্মার্ট মিটার খোলার দাবিতে বিষ্ণুপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন

বহু গ্রাহককে নানা ভয় দেখিয়ে স্মার্ট মিটার বসানো হয়েছিল বাঁকুড়ায়। এখন গ্রাহকরা তা খোলার দাবি তুলছেন। আন্দোলন তীব্রতর করতে

সমস্ত অয়েল মিল অ্যাসোসিয়েশন, ধানকল, গমকল, লেদ-গ্রিল অ্যাসোসিয়েশন, চেম্বার্স অফ কমার্স, মিষ্টান্ন শিল্প, তাঁত শিল্প সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে বিষ্ণুপুর কে এম হাইস্কুলে ১৩ জুলাই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অয়েল মিল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সাধন কর।

শেখ মনজুর আলি প্রস্তাব পাঠ করেন। স্মার্ট মিটারের মধ্য দিয়ে কী ভাবে গ্রাহকদের টাকা লুঠ করা হয়, তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন আশীষ দে, সন্তোষ গরাই, বেচু দত্ত, অমিয় গোস্বামী, গোবিন্দ ঘোষ, তারাপদ গরাই, সৌমেন দত্ত দেবাশিস বীট প্রমুখ। স্মার্ট মিটারের গ্রাহক স্বার্থবিরোধী নানা দিক তুলে ধরেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তমাল নন্দ।

প্রধান বক্তা অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস রাজ্যের সমস্ত জেলায় এবং দেশের অধিকাংশ রাজ্যে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ধারাবাহিক আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। আন্দোলনের চাপে সরকার পিছু হটে স্মার্ট মিটার বসানো বন্ধ করেছে, তা বিশদ আলোচনা করেন। কনভেনশন থেকে সাধন করকে সভাপতি, শেখ মনজুর আলিকে সম্পাদক করে ২৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির সভা

হাওড়ার উলুবেড়িয়া বাজারপাড়ায় ১৪ জুলাই 'রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির' একটি সভা হয়। সভায় হাওড়া গ্রামীণ জেলার আশা, মিড-ডে মিল কর্মী ও ট্রেন্ড ধাইমা ইউনিয়নের সদস্যরা সমবেত হন। এদের সংগঠিত করেন মিনতি সরকার, পম্পা সরকার ও নিখিল বেরা। প্রধান বক্তা খাদিজা বানু বলেন, তালাক, বহুবিবাহ, নিকাহ হালালা ইত্যাদি সমস্যায় বহু নারীর জীবন বিপর্যস্ত। সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে এই সমস্যাগুলি সহ সমস্ত ধরনের নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। স্বামী পরিত্যক্তা, তালাক প্রাপ্তা, বিধবা, নির্যাতিতা, দুঃস্থ অসহায় মেয়েদের স্বনির্ভর করার দায়িত্ব সরকারকে নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

দিল্লিতে আশাকর্মীদের বিক্ষোভ

সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, নিয়মিত বেতন সহ নানা দাবিতে দিল্লির কয়েকশো আশাকর্মী বিক্ষোভ দেখান। ৭ জুলাই সিভিল লাইনস মেট্রো স্টেশন থেকে আশাকর্মী ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে বিশাল মিছিল বিকাশ ভবন-২ তে আশা মিশনের কার্যালয়ের দিকে এগোতে থাকে। ড্রামা সেন্টারের কাছে পুলিশ মিছিল আটকে দিলে সেখানেই শুরু হয় বিক্ষোভ সভা। বিক্ষোভ সভা থেকে এক প্রতিনিধিদল কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি জানান, দিল্লি সরকারকে অবিলম্বে আশাকর্মীদের দাবি পূরণ করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করে বিকল্প শিক্ষানীতি চালুর দাবি বিহারের শিক্ষাবিদদের

জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি প্রস্তাবিত ‘বিকল্প শিক্ষানীতি’ গ্রহণ করতে হবে— দাবি তুললেন বিহারের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। ১৪ জুলাই মুজফ্ফরপুরের মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ ভবনে সেভ এডুকেশন কমিটির মুজফ্ফরপুর শাখা আয়োজিত আলোচনা সভায় এই দাবি উঠে আসে। কমিটির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর এই বিকল্প শিক্ষানীতি বিশদে ব্যাখ্যা করেন। বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ ডঃ হরেরাম মাহাতো, ডঃ বিজয় কুমার জয়সোয়াল, ডঃ এম এন রিজবি প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বিপুল শর্মা, সঞ্চালনা করেন বিহার মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘের সভাপতি রামপ্রীত রায়।

প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ করার দাবি মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রশাসনিক হয়রানিতে নাজেহাল মোটরভ্যান চালকেরা। কোথাও আরটিও দপ্তরের অধীন মোটর ভেহিকেলস কর্মীরা, কোথাও ট্রাফিক পুলিশ, আবার কোথাও থানার পুলিশ পণ্য বোঝাই মোটরভ্যান আটক করছে। কখনও বিনা রসিদে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করছে, বলপূর্বক গাড়ি না চালানোর মুচলেকা লিখিয়ে নিচ্ছে।

এর প্রতিবাদে ১৮ মে কলকাতায় মোটরভ্যান চালকদের একমাত্র রেজিস্টার্ড সংগঠন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের ডাকে ১০ সহস্রাধিক চালক রাজ্য পরিবহণ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পরিবহণ মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং ইউনিয়নের দাবি মতো সমস্যা নিয়ে পরিবহণ মন্ত্রীর সাথে ইউনিয়নের বৈঠকের প্রতিশ্রুতি দেন। সেইমতো ১৪ জুলাই সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত সাহার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল পরিবহণ মন্ত্রীর সাথে দেখা করেন এবং জেলাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট হয়রানির লিখিত তালিকা পেশ করেন। ইউনিয়নের বক্তব্যের সাথে সহমত হয়ে মন্ত্রী হয়রানি বন্ধেকার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

৫ আগস্ট বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবস উপলক্ষে আলিপুরদুয়ারে কর্মীসভা। ১৯ জুলাইয়ের এই সভায় বক্তব্য রাখেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থার প্রতিবাদে পথে মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন

বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা ও বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার বিরুদ্ধে পথে নামল অল ইন্ডিয়া মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন। সম্প্রতি ওড়িশা, আসাম, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে হকার, রাজমিস্ত্রি, দর্জি ইত্যাদি পেশায় কাজ করে কোনও মতে সংসার নির্বাহ করা এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা বারবার হেনস্থা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। বাংলাভাষী হলেই বাংলাদেশি বা মুসলিম হলেই রোহিঙ্গা তকমা দিয়ে কোথাও বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হচ্ছে, আবার কোথাও দিনের পর দিন ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক করা হচ্ছে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, জমির দলিল দেখিয়েও নিস্তার নেই। আসামে এনআরসি তালিকাভুক্ত সংখ্যালঘুদেরও উচ্ছেদ করা হচ্ছে। ইলেকশন কমিশন মারফত ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে স্থায়ী ঠিকানা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম বাদ দেওয়ার। বিজেপি সরকারের এইসব হঠকারী কাজের প্রতিবাদে সরব হয়ে রাস্তায় নেমেছে অল ইন্ডিয়া মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ১৪ জুলাই রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ১৭-২৩ জুলাই জেলায় জেলায় ডিএম দপ্তরে বিক্ষোভ দেখিয়ে নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়। পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, উত্তর ২৪ পরগণা, কোচবিহার, নদিয়া ডিএম-এর কাছে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরায় শিক্ষা অধিকর্তাকে স্মারকলিপি এ আই ডি এস ও-র

১৮ জুলাই এআইডিএসও ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার উদ্দেশে স্মারকলিপি

দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল, প্রতিটি স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, প্রতিটি বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সহ শিক্ষার সর্বস্তরে ফি মকুব ইত্যাদি দাবি তুলে ধরা হয়। আগে এক পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এআইডিএসও ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি রামপ্রসাদ আচার্য বলেন যে, ১২৫টি সরকারি স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় এনে অতিরিক্ত ফি ধার্য করে ও আচমকা নবম শ্রেণি থেকে ইংরেজি মাধ্যম চালু করে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি আরও ২৫টি স্কুলকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ৫৮৮টি স্কুল মাত্র ১ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এখনও বহু স্কুলে সমস্ত বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়নি। কোনও স্কুলেই পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস পড়ানো হয় না। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে। শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের উদ্দেশ্যে সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ কার্যকর করা হচ্ছে।

সরকারি শিক্ষা বাঁচাতে রাজ্যের জনসাধারণকে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা যুগ্ম অধিকর্তা এবং ওএসডিকে স্মারকলিপি দেয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন রাজ্য সভাপতি রামপ্রসাদ আচার্য, রাজ্য সম্পাদক রাজু আচার্য ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রীতিলতা দেবনাথ।

হর্টিকালচার দপ্তরে স্মারকলিপি

সাম্প্রতিক বন্যা ও অতিবর্ষণে রাজ্যের ফুলচাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতিপূরণ দেওয়া সহ ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ীদের বিভিন্ন দাবিতে ১৭ জুলাই সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে হর্টিকালচার দপ্তরের সচিবকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সহকারী সভাপতি দেবব্রত কোলে, সদস্য সুভাষ সাউ প্রমুখ। ফুলকে সরকারি কৃষিপণ্য হিসেবে স্বীকৃতি ও কলকাতার মল্লিকঘাট ফুলবাজার সহ জেলাগুলির অস্থায়ী ফুলবাজার সংস্কার, সরকারি উদ্যোগে হিমঘর এবং আধুনিক ফুলের বাজার নির্মাণ সহ অন্যান্য দাবি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সচিব প্রতিনিধিদলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

পাঠকের মতামত

চাই সঠিক নেতৃত্ব

কে লড়বে কার বিরুদ্ধে? সব ভোটবাজ রাজনৈতিক দলই দোষে দুষ্ট। ব্যপম কেলেঙ্কারি, সর্বভারতীয় নিট কেলেঙ্কারির অভিযোগে অভিযুক্ত বিজেপি দল। সিপিএম কেরলে আশা কর্মীদের উপর নানা অবিচার এবং পুলিশি অত্যাচার চালাচ্ছে, ত্রিপুরাতে তাদের আমলে বেআইনিভাবে নিযুক্ত ১০ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে গেছে। কংগ্রেস আগেই দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত। বিজেপির উত্থান কংগ্রেসের দুর্নীতির সুযোগ নিয়েই। তাই এরা লড়াই করার কথা বললেও সে বলার মধ্যে সত্যিকারের তেজ থাকে না। লড়াইয়ের তেজ আসে সত্যিকারের আদর্শগত ভিত্তি থেকে, মূল্যবোধের রাজনীতি থেকে। এই দলগুলির একটাই আদর্শ— যে কোনও উপায়ে ভোটের বৈতরণী পার হওয়া, মানুষের সমস্যার সমাধান নয়। ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্য এরা সাম্প্রদায়িক তাস খেলতেও রাজি। মানুষকে এখন ভাবতে হবে তাদের জীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে সত্যিকারের লড়াই করবে কারা।

গৌতম দাস, মালদা

বেছে নিন মূল্যবোধের রাজনীতি

বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে যেখানে চাল-ডাল-তেল-নুন থেকে সমস্ত জিনিসপত্রের দাম নির্দিষ্ট করে গোটা দেশে এক দামে কেনাবেচা চলে, সেখানেও শোনা যাচ্ছে কালোবাজারি হচ্ছে, দু-নম্বরি হচ্ছে, নকল জিনিস বিক্রি হচ্ছে, ভেজাল ওষুধ বিক্রি হচ্ছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে তথাকথিত বড় দলগুলির যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার দরকার ছিল, সেখানে ভোটরাজনীতিতে প্রচারের আলোয় থাকার জন্য যতটুকু দরকার তার বেশি এই দলগুলি এগোতে চায় না।

আসলে এখন ক্ষমতার রাজনীতিতে টিকে থাকতে গেলে প্রয়োজন কোটি কোটি টাকা, বাহুশক্তি, আর প্রশাসনের সহায়তা। ভয় দেখিয়ে, টাকা ছড়িয়ে, প্রশাসনকে হাত করে পাঁচ বছর গদিতে থাকার জন্য যা যা করা দরকার তারা তাই করে। এই যে কোটি কোটি টাকা ভোটের সময় খরচ করে রাজনৈতিক দলগুলো, তা আসে কোথা থেকে? এর মূল উৎস শিল্পপতিদের টাকার থলি। তাই মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে, কালোবাজারি হলে, ভেজাল ওষুধ থাকলেও ভোটবাজ এই দলগুলি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে না।

অন্য দিকে এমএলএ, এমপি-র শক্তিতে নয় জনসমর্থনের শক্তিকে গণআন্দোলনের দল হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে এসইউসিআই(সি)। হাজার হাজার মানুষের নৈতিক সমর্থনের জোরে একের পর এক আন্দোলন করে চলেছে দলটি। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দাবি আদায়ও করছে। আশাকরি, আগামী দিনেও দলটি এইভাবে লড়াই করে যাবে। বিবেক-মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে রেখে আজকের যুগে লড়াই করাটা খুবই কঠিন। এ দলের নেতা-কর্মীরা বরেণ্য মনীষী ও বিপ্লবীদের স্মরণে রেখে সেই কঠিন লড়াই-ই চালিয়ে যাচ্ছে।

সারা রাজ্যে হাজার হাজার কর্মী শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট সহ্য করে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে জীবনে বহন করে আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বাংলার মেহনতি, গরিব, মধ্যবিত্ত, খেটে-খাওয়া মানুষের জন্য। একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে এদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি।

সুদর্শন মান্না, তমলুক

নেতাদের তরজা, ১০০ দিনের কাজটুকুও হাতছাড়া পশ্চিমবঙ্গে

দক্ষিণ ২৪ পরগণার আরতি মণ্ডল ৫৫ বছর বয়সে কাজের খোঁজে তামিলনাড়ুর উদ্দেশে ট্রেনে চেপে বসলেন। স্বামী অসুস্থ, পরিবারের হাল ধরতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করার জন্য ভিনরাজ্যে পাড়ি দিলেন স্বজন-প্রতিবেশীদের ছেড়ে। বাড়ি ছেড়ে এতদূর কেন? উত্তর এল, এখানে কাজ কই? আগে যদিও ১০০ দিনের কাজে কিছু টাকা পেতাম, এখন তাও নেই। কী করে চলবে সংসার, ভাত-ই বা জুটবে কী করে? আরতি দেবীর মতো অবস্থা রাজ্যের বহু মানুষেরই। হাইকোর্ট সব জবকার্ডধারীকে ১০০ দিনের কাজ দেওয়ার কথা বললেও আরতির মতো বহু জন হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছেন।

বেকার জীবনে ১০০ দিনের কাজ কিছুটা হলেও আশার আলো, হতদরিদ্র পরিবারে কয়েক দিনের ভাতের সংস্থান। গ্রাম-শহরের বহু সংসারে কিছুটা হলেও সুরাহা দেয় এই প্রকল্প। ২০০৫-এর 'মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট' (এমনারেগা) আইনে ১০০ দিনের কাজ পাওয়া প্রত্যেক আবেদনকারীর অধিকার। এটা কেন্দ্রীয় প্রকল্প হলেও জব কার্ডের মাধ্যমে রাজ্য সরকার এই কাজ বণ্টন করে। কিন্তু গত তিন বছর এই প্রকল্পে কাজ দেওয়া বন্ধ পশ্চিমবঙ্গে। এই প্রকল্পে দু' হাজার কোটি টাকার দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতারা। টাকা নয়ছয়ের কারণ দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ রেখেছে এ রাজ্যে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই হঠকারী সিদ্ধান্তে সমস্যায় পড়েছেন এ রাজ্যের গরিব মানুষ। দুর্নীতি আটকানো দরকার। কিন্তু দুর্নীতির অজুহাতে প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া তো গরিব মানুষগুলিকে অনাহারের দিকে ঠেলে দেওয়া। রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারকে দোষারোপ করেই দায়িত্ব শেষ করেছে। প্রকল্পকে দুর্নীতিমুক্ত করার কোনও চেষ্টা নেই তাদের। দুই সরকারের টানাপোড়েনে গরিব মানুষগুলি কাজ হারাচ্ছে।

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট এই অচলাবস্থায় হস্তক্ষেপ করে ১ আগস্ট থেকে প্রকল্প আবার শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার গ্রামীণ মজুররা আরও কত গরিব হয়েছে, কী হারে পরিযায়ী শ্রমিক বেড়ে চলেছে, বেকারির তালিকা কত লম্বা হয়েছে, দারিদ্র ও অপুষ্টি কত বেড়েছে, তার খবর তো এই শাসক দলগুলির কারওরই রাখার দরকার পড়ে না! ২০২৫-এর ১ এপ্রিল থেকে এই প্রকল্পে দৈনিক মজুরি ৩৪৯ টাকা থেকে অনেক টালবাহানার পর নামমাত্র বেড়ে হয়েছে ৩৭০ টাকা। তা-ও বছরে মাত্র ১০০ দিন কাজ। বাকি ২৬৫ দিন এই মানুষগুলির কোনও নির্দিষ্ট কাজ নেই, আয়ও নেই। ফলে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন প্রান্তিক মানুষেরা।

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিও পিছিয়ে নেই দুর্নীতিতে। উত্তরপ্রদেশে ২০২২-২৩-এ এই প্রকল্পে ৭.৪৩ লক্ষ ভুয়ো জব কার্ড বাতিল হয়েছে। ওই রাজ্যের সম্বলে বহু মৃত ব্যক্তির জব কার্ড দেখিয়ে টাকা তোলা হয়েছে। এমনই এক ঘটনা প্রসঙ্গে সঞ্জীব কুমার নামে এক ব্যক্তি বলেন, তাঁর ঠাকুরদা ২০২০ সালে মারা যাওয়ার পরেও তার নামে টাকা তোলা হত। কিছুদিন আগে সরকারি আধিকারিকরা অনুসন্ধানে আসতেই বিষয়টি জানা গেছে। এমনকি উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম সিং যাদব ইন্টার কলেজের প্রিন্সিপাল ঋষিপাল সিংয়ের নামেও জবকার্ড রয়েছে এবং তাতে টাকা তোলার অভিযোগ এসেছে।

সম্প্রতি বিজেপি শাসিত গুজরাটে আদিবাসী অধ্যুষিত দাহোদ এলাকায় এই প্রকল্পে ৭১ কোটি টাকার দুর্নীতিতে পঞ্চায়েত মন্ত্রী বাচ্চু খাবড়ের এক ছেলে গ্রেপ্তার হয়েছে। আর এক ছেলে সহ আরও অনেকেই অভিযুক্ত। এই ঘটনা গরিব মানুষের প্রকল্প নিয়ে বিজেপি নেতাদের পরিকল্পনামাফিক ডাকাতি ছাড়া আর কিছু নয়। এই দুর্নীতির তদন্ত হওয়া দরকার। পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে অপসারণের দাবি উঠলেও বিজেপি নেতৃত্ব চুপ।

উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাটে ১০০ দিনের প্রকল্পে দুর্নীতিতে বিজেপি নেতারা জড়িয়ে পড়ায় পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের যেন ধড়ে প্রাণ এসেছে। তারা যুক্তি করছেন, আমরা দুর্নীতি করলেই দোষ! বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি হলে যদি প্রকল্পের বরাদ্দ বন্ধ হয়, তা হলে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটেও তো দুর্নীতি হয়েছে। সেখানে বরাদ্দ বন্ধ হচ্ছে না কেন, সেখানে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার বলে? পারস্পরিক অভিযোগের তির ছোড়াছুড়ি চলছে। কিন্তু তাতে না বন্ধ হচ্ছে দুর্নীতি, না চালু হচ্ছে বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রকল্প।

জবকার্ডের মাধ্যমে দিন গুজরান করেন যারা, তারা কীভাবে বেঁচে থাকবেন, তা নিয়ে এতটুকু মাথাব্যথা নেই বিজেপি বা তৃণমূল সরকারের। বিজেপি নেতারা যতই 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ'-এর কথা বলুন, এই মানুষগুলির জন্য এতটুকু দরদবোধ থাকলে গত কয়েক বছরে এই প্রকল্পের বরাদ্দ ক্রমাগত কমিয়েই যেতেন না। অসহনীয় এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে যখন প্রয়োজন ছিল বরাদ্দ আরও বাড়ানো, তখন একদিকে বরাদ্দ কমিয়ে, অন্য দিকে জবকার্ডে দুর্নীতির অভিযোগে প্রকল্প বন্ধ করে দিয়ে আসলে সাধারণ মানুষকে 'হাতে না মেরে ভাতে মারার'ই কৌশল নিচ্ছেন তারা। আর দুর্নীতি দেখে চোখ বুজে থাকা তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা ভোটের আগে সস্তা চমকে রাজ্যের মানুষকে ভোলাতে এই প্রকল্পের পাওনা-বরাদ্দ নিয়ে মায়াকান্না কাঁদছে!

বিজেপির বিড়ম্বনা

তিনের পাতার পর

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঢুকিয়েছেন বলে আরএসএস-বিজেপির এত আপত্তি, সেই ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থার আগে থেকেই বলতে শুরু করেছিলেন, আমরা এতদিন সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়িয়েছি, তারা আমাদের ভোট দেয়নি। এখন থেকে আমি সংখ্যাগুরু হিন্দুকে দেখব। ১৯৮০-র লোকসভা নির্বাচনে এই ইন্দিরা গান্ধীকেই পুরোপুরি সমর্থন জানিয়েছিল আরএসএস। এই কংগ্রেসই বাবরি মসজিদ বিতর্ক খুঁচিয়ে তুলতে তার তালা খুলেছিল। ইন্দিরা গান্ধীর যেমন সমাজতন্ত্র নিয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না, ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়েও ছিল না। তিনি নিজের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় প্রগতিশীল সাজতে শব্দ দুটি নিয়ে খেলা করেছেন। এ দিকে নিজে ভোটের স্বার্থে কখনও আরএসএস, কখনও নানা হিন্দু ধর্মগুরুর পা মাথায় ঠেকিয়েছেন, কখনও মুসলিম মৌলবাদীদের তোষণ করেছেন। সবটাই ছিল তাঁর ভোট কৌশল।

বিজেপি এখন এ নিয়ে এত হইচই তুলছে কেন? একই কারণ— ভোট কৌশল। তারা মানুষের কাছে ভোট চাইতে দাঁড়াবে কী নিয়ে? এমন কোনও কাজের কথা বলতে তারা অক্ষম যেটা জনস্বার্থ রক্ষায় বিজেপি করেছে। একটি অ্যাজেন্ডাই তাদের বেঁচে আছে— হিন্দুত্বের ত্রাতা সাজা। যদিও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মোদি সরকারের জনবিরোধী ভূমিকায় মানুষের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে জিগির তুলে আরএসএস-এর হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে ফেরি করে তারা পরবর্তী ভোট উতরোতে চাইছে। চেষ্টা— যদি এতে হিন্দু কূলতিলক সাজা নরেন্দ্র মোদির গায়ে লেপ্টে থাকা স্বৈরাচার এবং অপশাসনের কাদা মুছে ফেলা যায়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে বিজেপির একটা বিড়ম্বনা আছে। একদিকে এই বিশাল দেশে অসংখ্য ভাষা, ধর্ম, সম্প্রদায়, উপজাতির সব মানুষকে এক ছাঁচে ঢালার চেষ্টা যে ব্যর্থ হবেই এ সত্য তারাও অস্বীকার করতে পারে না।

সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ নিজেদের জীবনধারার স্বাভাবিক ছন্দেই ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মিলেমিশে আছেন বহুকাল। নেতারা চাইলেই তাঁরা সব একে অপরকে শত্রু জ্ঞানে পরস্পরের গলায় ছুরি বসাতে শুরু করবেন, এটা দিবাস্বপ্ন! এ ছাড়া দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মনীষীদের চিন্তার ছোঁয়া আজও ভারতের মাটিতে লেগে আছে। বিজেপির রাজনীতি যেখানে বারবার বাধা পায়। ফলে মাঝে মাঝে প্রধানমন্ত্রীকেও 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' ইত্যাদি বলতে হয়। তাই চাইলেও বিজেপি জনমানস থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মুছে দিতে পারছে না। তাই ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী জরুরি অবস্থার সাথে 'সমাজতন্ত্র' আর 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দ দুটিকে সমার্থক করে দেখিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছেন তাঁরা।

বিজেপি নেতাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাক হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা, স্বামী বিবেকানন্দের একটা কথা— 'এখন ভারতে আধুনিক যুগ। কী ভাবে জনগণের মধ্যে সেকুলার জ্ঞানের বিস্তার হয়, সেটাই গুরুতর প্রশ্ন' (জনগণের অধিকার, পৃষ্ঠা ৬২)। বিজেপি নেতারা বিবেকানন্দের বইটা অন্তত একবার পাতা উল্টে দেখবেন নাকি!

‘আমরা গণহত্যাকারীদের দোসর হব না’ বলছেন ইউরোপের পরিবহণ শ্রমিকরা

গাজায় ইজরায়েলের লাগাতার নির্মম গণহত্যার বিরুদ্ধে যখন বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই নিশ্চুপ, তখন প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছেন ইউরোপের পরিবহণ শ্রমিকরা। অতি সম্প্রতি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের বিমানবন্দর-কর্মীরা ইজরায়েলে সামরিক পণ্যবাহী বিমান পাঠাতে অস্বীকার করেছেন। দুটি শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে প্রতিবাদরত শ্রমিক-কর্মচারীরা বলেছেন, ‘ইজরায়েলে সামরিক পণ্য পরিবহণ করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে গাজার ওপর চলা অন্যায়ের মাত্রা বাড়াতে আমরা স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করছি।’ শুধু বিমানবন্দর-কর্মীরাই নন, রেল সহ অন্যান্য পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত গোটা ফ্রান্সের পরিবহণ-কর্মীরাও আক্রান্ত প্যালেস্টিনীয়দের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে জানিয়ে দিয়েছেন, যুদ্ধবাজ ইজরায়েলে সামরিক পণ্য পরিবহণ করতে তাঁরা রাজি নন। একটি যুক্ত বিবৃতিতে পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকরা বলেছেন, ‘গোটা একটি জাতির উপরে এই জঘন্য আক্রমণ দেখে আমরা নীরব থাকতে পারি না’।

এই প্রথমবার নয়, গত জুনেও প্যারিস বিমানবন্দরের শ্রমিক-কর্মচারীরা ইজরায়েলে সামরিক পণ্য পরিবহণ না করার ডাক দিয়েছিলেন। ফ্রান্সের জলবন্দরের শ্রমিকরাও একই ভাবে ইজরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট হামলাবাজ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ফুঁসে ওঠা ক্ষোভের চাপে ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতারা প্রকাশ্যে ফ্রান্স সরকারকে ইজরায়েলের সঙ্গে লেনদেন বন্ধ করার অনুরোধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সাম্রাজ্যবাদী লুটের বখরার স্বার্থে ফ্রান্সের ম্যাক্রঁ সরকার সেই অনুরোধে কান দেয়নি। সেখানকার পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীরা গণহত্যাকারী ইজরায়েলের প্রতি ফ্রান্স সরকারের মৌন প্রশ্রয়ের তোয়াক্কা না করে ব্যাপক ভাবে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। একটি শ্রমিক সংগঠন বলেছে, ‘গোটা বিশ্বের মানুষ যাকে চরম অন্যায় বা অমানবিক বলে মনে করে, উপরমহলের কোনও চাপ বা কোনও চুক্তির অজুহাতে সেই অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা যায় না’। দেশের প্রতিটি শ্রমিককে আহ্বান জানিয়ে ওই সংগঠন বলেছে— ‘বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে এই জঘন্য গণহত্যা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। ইজরায়েলে সামরিক পণ্য পরিবহণের কাজ বয়কট করুন’।

গ্রিসে এথেন্স বন্দরের শ্রমিক-কর্মচারীরাও জাহাজ থেকে ইজরায়েলের জন্য পাঠানো মাল খালাস করতে রাজি নন। ইজরায়েলের জন্য সামরিক সরঞ্জামে বোঝাই একটি জাহাজের যেদিন এথেন্স বন্দরে আসার কথা, সে দিন ছাত্রছাত্রী, শ্রমিক সহ সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে বিক্ষোভের পরিকল্পনা করেছেন তাঁরা। উদ্দেশ্য, ওই জাহাজ থেকে মালপত্র খালাসে বাধা দেওয়া, যাতে ওখান থেকে ইজরায়েলে সামরিক সরঞ্জাম পৌঁছাতে না পারে। গাজায় হাসপাতাল, স্কুল সহ নারী-শিশুদের উপর বোমাবর্ষণ করছে যে ইজরায়েল, সেখানে সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর কথা ভাবতেই পারছেন না গ্রিসের শ্রমিকরা। তাঁদের সংগঠন মন্তব্য করেছে, ‘আমরা নিরীহ মানুষের রক্তে হাত রাঙাতে, গণহত্যাকারীদের দোসর সাজতে রাজি নই’। দেশের সরকার যা-ই করুক, সুইডেন, ইটালি, ব্রিটেন সহ ইউরোপের দেশে দেশে শ্রমিক-কর্মচারী ও জনসাধারণ গণহত্যাকারী ইজরায়েলে অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম পরিবহণে তীব্র আপত্তি জানাচ্ছেন। ব্রিটেনে বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীরা ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’ নামে একটি সংগঠন তৈরি করে ইজরায়েলে অস্ত্র সরবরাহে বাধা দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই সেখানকার সরকার ওই সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সুইডেনের বন্দর-শ্রমিকরাও ইজরায়েলের সঙ্গে পণ্য আদানপ্রদান বন্ধ করার পক্ষে রায় দিয়েছেন। ইটালিতে জেনোয়ার বন্দরশ্রমিকরা সম্প্রতি সংগঠিত হয়ে ব্রেসসিয়া বিমানবন্দরে ইজরায়েলে সামরিক মালবাহী বিমান উড়ানে বাধা দিয়েছেন।

এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে গোটা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া যখন এককাট্টা হয়ে অস্ত্র শানাচ্ছিল, নানা কৌশলের জাল বুনে শিশু সমাজতন্ত্রকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিল, ইউরোপের শ্রমিকরা আরও একবার রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে। মানুষের উপর মানুষের শোষণ বন্ধ করার মহান লক্ষ্য নিয়ে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের দুর্বার অগ্রগতি অপ্রতিহত রাখতে তাঁরা নিজের নিজের দেশের সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অবাধে গাজায় নির্মম গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইজরায়েল। দোসর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সরকার শুধু নিশ্চুপ তাই নয়, নিজের নিজের দেশের পুঁজিমালিকদের বিপুল মুনাফা লুটের সুযোগ করে দিতে তারা ইজরায়েলের এই বর্বর হানাদারিতে সব রকমের সহযোগিতা করছে। এই অবস্থায় ইউরোপের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের পেটোয়া সরকারগুলির বিরুদ্ধে পরিবহণ শ্রমিকদের এই প্রতিবাদী অবস্থানকে বিপুল অভিনন্দন। ‘আমরা নিপীড়িত মানুষের পক্ষে, যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে নয়’— প্রতিবাদী পরিবহণ শ্রমিকদের এই ঘোষণা আশা জাগায়, একদিন যুদ্ধবাজদের হাতের মুঠো থেকে শোষণ-নিষ্পেষণে জর্জরিত বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মুক্তি ছিনিয়ে আনবে এই শ্রমিক শ্রেণিই।

জীবনাবসান

নদিয়া জেলার কালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত রাধাকান্তপুর গ্রামের আবেদনকারী সদস্য কমরেড আব্দুল হান্নান ১১ জুলাই আকস্মিকভাবে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে ছাত্রাবস্থায় রাধাকান্তপুর গ্রামের এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর তৎকালীন সংগঠকদের প্রভাবে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। তখন থেকেই প্রথমে কংগ্রেস ও পরে সিপিএম শাসনে সরকারের জনবিরোধী যে কোনও নীতির বিরুদ্ধে দলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করে এসেছেন।

কৃষক আন্দোলনেও তিনি অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর সদাহাস্যময় নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের জন্য তিনি গ্রামের মানুষের আপনজন ছিলেন। তিনি ছিলেন এআইকেকেএমএস-এর নদিয়া জেলা কমিটির সদস্য এবং কালিগঞ্জ ব্লক কমিটির সভাপতি।

কমরেড আব্দুল হান্নানের মৃত্যুতে দল একজন নির্ভরযোগ্য কর্মীকে হারাল।

কমরেড আব্দুল হান্নান লাল সেলাম

৫ আগস্ট সমাবেশ

একের পাতার পর

যে ধরনের সংগ্রাম পরিচালনা করা দরকার, সিপিআই নেতারা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। তাঁরা পুরোনো বুর্জোয়া চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতির সাথে ছেদ ঘটিয়ে উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে পারেননি। ফলে নামে কমিউনিস্ট পার্টি হলেও তাঁরা একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টির জন্ম দিয়েছেন। এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই তিনি একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কঠিন সংগ্রাম শুরু করেন। বাস্তবে শুধুমাত্র আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে মূলধন করে তাঁরই মতো সহায়সম্বলহীন কয়েকজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে তিনি এক অসমসাহসী সংগ্রামের সূচনা করেন। তাঁর এই সংগ্রামের ফল ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠা এবং তার এগিয়ে চলা। বস্তুত এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ইতিহাস হল কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস। তাই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ও কমরেড শিবদাস ঘোষ এক ও অভিন্ন।

সমাবেশের প্রস্তুতি পরিচারিকাদের। বৈঠক বিধাননগরের পার্কেই। ২০ জুলাই

দল গঠনের এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে এ দেশের মাটিতে বিশেষীকৃত করেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে বহু নতুন বিষয় সংযোজিত করে তাকে সম্প্রসারিত করেছেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জন্মলগ্ন থেকেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যকে সামনে রেখে একের পর এক আন্দোলন গড়ে তুলেছে। তাঁর জীবদ্দশাতেই পার্টি সর্বভারতীয় স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৬ সালের ৫ আগস্ট তাঁর প্রয়াণের পর তাঁরই শিক্ষাকে পাথেয় করে আজ ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্যে পার্টির সাংগঠনিক কাজের আরও বিস্তার ঘটেছে এবং দেশের বাইরেও তাঁর চিন্তা ও সংগ্রামের প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ বছর আমরা ৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষের ৫০তম প্রয়াণ দিবস পালন করছি এমন একটা সময়ে, যখন দেশের আপামর জনসাধারণ জীবনযন্ত্রণায় জর্জরিত। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে ক্ষমতাসীন সরকার অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষা করার স্বার্থে নানা জনবিরোধী নীতি নিয়ে চলার ফলে সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্য আজ আকাশছোঁয়া। অনাহার ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু আজ নিত্যদিনের ঘটনা। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ সর্বস্তরে চরম দুর্নীতি। তার ফলে যোগ্য শিক্ষক চাকরি হারিয়ে পথে, ঘরে ঘরে বেকার। শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরি ও কাজের নিশ্চয়তা পাচ্ছেন না, চা-বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশা চরমে। কৃষকরা পাচ্ছেন না ফসলের দাম, অথচ চাষের খরচ বেড়েই চলেছে। ফলে বিরাট সংখ্যক কৃষক ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। একদিকে মদের ঢালাও ব্যবসা চলছে, অন্যদিকে বাড়ছে নারী নির্যাতন। আর তার সাথে সমাজের সামগ্রিক রুচি সংস্কৃতি ও নৈতিকতার চূড়ান্ত অবনমন ঘটছে।

এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ সংগঠিত হচ্ছে, আন্দোলন গড়ে উঠছে। এতে ভীত শাসক শ্রেণি। তারা জনজীবনের সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। এরই সাথে যুদ্ধের উন্মাদনা তৈরি করে দেশের মানুষকে মাতিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। শুধু এ দেশেই নয়, সারা বিশ্বের পুঁজিবাদী দুনিয়া অর্থনীতির তীব্র সংকট থেকে বাঁচবার জন্য নানা অছিলায় যুদ্ধবাধিয়ে চলেছে। নারী-শিশু সহ অগণিত মানুষ তার বলি হচ্ছেন।

দেশের মানুষকে এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য গণআন্দোলনগুলিকে সঠিক নেতৃত্বে জোরদার করার শপথ নেওয়ার আহ্বান জানায় ৫ আগস্ট। এই শপথ গ্রহণের লক্ষ্যে আগামী ৫ আগস্ট দলের রাজ্য কমিটি কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে সমাবেশের আয়োজন করেছে। বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এবং সভাপতিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে প্রেরণা নিয়ে বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গোটা রাজ্যের মানুষের কাছে এই সমাবেশকে সর্বতোভাবে সফল করার জন্য রাজ্য জুড়ে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। চলছে বাড়ি বাড়ি প্রচার, পাড়া বৈঠক, পথসভা, মিছিল, উদ্ধৃতি ও আন্দোলনের ছবি প্রদর্শনী, বুকস্টল প্রভৃতি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 50 Bengali Weekly July 25, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

মেখলিগঞ্জে পার্টি অফিস উদ্বোধন

১৬ জুলাই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমা কার্যালয় উদ্বোধন করেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শঙ্কর গাঙ্গুলী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এরপর স্থানীয় নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবে মহকুমার পাঁচটি লোকাল কমিটির কর্মীদের নিয়ে ৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উপলক্ষে এক সাধারণ সভা হয়। প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় জীবনসংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। একটি সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

হাসপাতালে বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ
নিয়োগে উদাসীন তৃণমূল সরকার

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে মেডিকেল অফিসার থেকে শুরু করে অধ্যাপক এবং স্বাস্থ্য প্রশাসকের বিপুল সংখ্যক বিভিন্ন পদ শূন্য হয়ে পড়ে থাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং মেডিকেল শিক্ষার হাল আজ অত্যন্ত সংকটাপন্ন। হাজার হাজার এমবিবিএস এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পাশ করে বসে রয়েছেন, কোনও নিয়োগ নেই। সম্প্রতি যাঁরা এমডি বা এমএস পাশ করেছেন, তাঁদেরও পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে না। স্বাস্থ্য ভবনে বসিয়ে রেখে ডাক্তারি পেশা বহির্ভূত বিভিন্ন কাজ তাঁদের দিয়ে করানো হচ্ছে। ফলে সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য দপ্তরে একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বদলি, পদোন্নতি নিয়ে চলছে সীমাহীন দুর্নীতি এবং অরাজকতা।

সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম অবিলম্বে সমস্ত শূন্যপদে ডাক্তার, গ্রুপ-ডি, সুইপার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর পদে নিয়োগ করার দাবি জানিয়েছে। স্বচ্ছ এবং নিয়মমাফিক বদলি ও পদোন্নতি নীতি, চালু করা, থ্রেট কালচার ও প্রশাসনিক সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, ওষুধের গুণমান পর্যবেক্ষণের পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো, মেডিকেল শিক্ষার গুণমান উন্নয়নে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ইত্যাদির দাবি জানানো হয়েছে।

১১ দফা দাবিতে স্বাস্থ্য ভবনে মুখ্য সচিব, স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ১৮ জুলাই দাবিপত্র দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ডাঃ স্বপন বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ পুলকেন্দু ঘোষ প্রমুখ।

স্কুলকর্মীদের বিভিন্ন দাবিতে অন্ধ্রপ্রদেশে বিক্ষোভ

বেতন মাত্র ৬ হাজার টাকা, তাও আবার মাসের পর মাস বাকি। এই টাকায় এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে সংসার চলে? ক্ষোভে ফুঁসছেন অন্ধ্রপ্রদেশের স্কুলকর্মীরা।

অবিলম্বে বকেয়া বেতন দেওয়া, বেতন বৃদ্ধি করে ১৫ হাজার টাকা করা, কর্মী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পিএফ, ইএসআই-এর সুবিধা দেওয়া প্রভৃতি দাবিতে ১৩ জুলাই এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে বিজয়ওয়াড়ায় বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পরে এক কনভেনশনে ইউনাইটেড স্কুল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গড়ে তোলা হয়। বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সভাপতি কমরেড সুব্বা রেড্ডি।

কনভেনশন থেকে কমরেড সি এইচ প্রমীলাকে সভাপতি এবং কমরেড এম বাসবরাজুকে সম্পাদক, কমরেড শেখরকে কোষাধ্যক্ষ করে ২০ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

মাইসোরে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পুদুচেরি রাজ্যের নির্বাচিত পার্টিকর্মীদের নিয়ে ১৮-২১ জুলাই মাইসোরে অনুষ্ঠিত হল রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির। শিবির পরিচালনা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী ও কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেডস কে শ্রীধর, সুভাষ দাশগুপ্ত, জয়সন জোসেফ, কে উমা, বি অমরনাথ ও রেঙ্গাস্বামী।

আসামে বাংলাভাষীদের উচ্ছেদ বিজেপি সরকারের
এসইউসিআই(সি)-র প্রতিবাদ

আসামের বিজেপি সরকার সরকারি জমি দখলমুক্ত করার নামে, সেখানে বহু বছর ধরে বসবাসরত হতদরিদ্র, অসহায়, ভূমিহীন মানুষকে, বিকল্প পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করছে। এটা করতে গিয়ে বিষাক্ত জাতিবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জন্ম দিয়ে যারা নিশ্চিত রূপে ভারতীয় নাগরিক এবং যারা এনআরসি-র অন্তর্ভুক্ত তাদের নির্বিচারে উচ্ছেদ করছে। জায়গায় জায়গায় উদ্বাস্তু নিরীহ দরিদ্র মানুষের কাতর আবেদন দু'পায়ে মাড়িয়ে গুলি চালিয়ে তাদের হত্যা করছে। এই অমানবিক উচ্ছেদের তীব্র নিন্দা করেছেন দলের আসাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস।

১৩ জুলাই এক প্রেস বিবৃতিতে তিনি বলেন, যেটা গভীর বেদনার তা হল মহান পুরুষ, আসাম তথা সমগ্র ভারতের গৌরব, আসামে সভ্যতা স্থাপনের মহান রূপকার শ্রীমন্ত শংকর দেবের শিক্ষা, আবেদন ও আর্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিজেপি সরকার তার পক্ষে প্রতিদিন সাফাই গাইছে এবং উল্লাস প্রকাশ করছে।

আসাম সরকারের কাছে আমাদের দাবি, এই অমানবিক উচ্ছেদ অভিযান অবিলম্বে বন্ধ করুন, উচ্ছেদ হওয়া হাজার হাজার হতদরিদ্র মানুষকে খোলা আকাশের নিচে অভুক্ত রেখে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া থেকে সরে এসে মহান পুরুষ শ্রীমন্ত শংকর দেবের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐক্যের বাণীকে উজ্জ্বল ও অক্ষুণ্ণ রাখুন।

এই সংকটজনক মুহূর্তে জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে সকল জনগণের প্রতি আমাদের আন্তরিক আবেদন, সকল প্রকার সংকীর্ণতা, খণ্ড চিন্তা, সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে এই উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করার দাবিতে গণতান্ত্রিক, মানবিক, মূল্যবোধের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হোন, তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলুন ও একে প্রত্যাহার করতে আসাম সরকারকে বাধ্য করুন এবং সমস্ত জনগণের ঐক্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করুন।

বীরভূম জেলাশাসক দপ্তরে খাদান শ্রমিকদের বিক্ষোভ

সিউড়িতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পাথর খাদান শ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে ৩ জুলাই জেলাশাসক দপ্তর অভিযানে অংশ নেন সাত শতাধিক খাদান শ্রমিক। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা, রাজ্য সহ-সভাপতি কমরেড নন্দ পাত্র, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জয়ন্ত সাহা প্রমুখ।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com